কিউএস সূচকের আলোকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 15 August 2026, 02:42 AM | বিভাগ: ফিচার

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান, সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক অবস্থান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূচকের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের দেখিয়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা পর্যাপ্ত একাডেমিক সহায়তা নিশ্চিত করতে পারছে; একাডেমিক খ্যাতি দেখিয়েছে বৈশ্বিক একাডেমিক সমাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান, গবেষণা ও শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা কতটা প্রতিষ্ঠিত; আর এখন আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের সামনে উচ্চশিক্ষার আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন হাজির করছে-বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে কতটা আন্তর্জাতিক?

এই প্রশ্নটি কেবল বিদেশি শিক্ষার্থী বা বিদেশি শিক্ষক সংখ্যার হিসাব নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জ্ঞান বিনিময়, গবেষণা সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক সুনাম। অতএব, কিউএস-এর আন্তর্জাতিক

শিক্ষক অনুপাত এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য নিছক র‍্যাংকিং বা অবস্থান নির্ধারণের সূচক হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। বরং এগুলোকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিকীকরণ বা বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ জানালা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কিউএস-এর বর্তমান বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত বলতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষকের অনুপাতকে বোঝানো হয়। কিউএস-এর ভাষ্যে, বিদেশি শিক্ষকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হওয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক আন্তর্জাতিক সুনাম এবং সেখানে কাজ করার অনুকূল পরিবেশের ইঙ্গিত দিতে পারে। একই সঙ্গে বিদেশি শিক্ষকরা তাঁদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক গবেষণা-সংযোগ নিয়ে আসেন, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক ও সহযোগিতা বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর অনুপাতকে নির্দেশ করে। কিউএস-এর বিশ্লেষণে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আকর্ষণ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্য এবং শিক্ষার পরিবেশের আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ একজন বিদেশি শিক্ষার্থী শুধু একটি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী নন; তিনি একটি ভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, ভাষা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। আন্তর্জাতিকীকরণকে কেবল বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী থাকলেও যদি তাঁদের সঙ্গে কাজ করার মতো আন্তর্জাতিক শিক্ষক, আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম, ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত উচ্চতর শিক্ষার কার্যক্রম, শিক্ষার্থী বিনিময়, আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা এবং সহায়ক ক্যাম্পাস পরিবেশ না থাকে, তাহলে সংখ্যাগত আন্তর্জাতিকীকরণ খুব বেশি অর্থবহ নাও হতে পারে। একইভাবে কয়েকজন বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ করলেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক হয়ে যায় না। প্রকৃত আন্তর্জাতিকীকরণ হলো এমন একটি পরিবেশ, যেখানে দেশি ও বিদেশি শিক্ষক-শিক্ষার্থী একসঙ্গে শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জ্ঞান বিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন। এ কারণেই কিউএস-এর আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতকে পাশাপাশি দেখা জরুরি।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য এখানেই। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, নতুন ক্যাম্পাস, বিভাগ ও শিক্ষাক্রম তৈরি হয়েছে; কিন্তু একই অনুপাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়েনি। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৪৮তম বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মোট আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২,২৮১ জন; এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭৭ জন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,৬০৪ জন। একই প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৪৪,৪১,৭১৭ জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এই বৃহত্তর সংখ্যার মধ্যে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসাও অন্তর্ভুক্ত। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণের সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সংকেত দেয়।

এই পরিস্থিতির তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থানের দিকে তাকাই। কিউএস-এর বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪০,৩৩৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ১৮২ জন এবং ২,১৬৪ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক প্রায় ১ শতাংশ; নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬,০২৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ৭৬ জন এবং ৯০২ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ৬ শতাংশ; ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭,৩২১ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ৫২৯ জন এবং ৮০৩ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ৫ শতাংশ; আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশে ৯,২৮৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ৮৯০ জন এবং ৫৬৪ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ৪ শতাংশ। এগুলো বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় গড় নয়; বরং কিউএস-এর প্রকাশিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য থেকে নেওয়া উদাহরণ। তবে এগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে-কিছু প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে দৃশ্যমান হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষকের অংশ খুবই সীমিত।

এই তথ্য থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন উঠে আসে। আমরা কি সত্যিই বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করতে পেরেছি? বিশ্বের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু নিজেদের দেশের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে না; তারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। বিদেশি শিক্ষার্থীর উপস্থিতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষকে বৈচিত্র্যময় করে, ভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আলোচনায় নিয়ে আসে এবং শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে। একটি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী যখন একই শ্রেণিকক্ষে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা ইউরোপের শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করে, তখন তাঁর শিক্ষা শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষা ও বৈশ্বিক নাগরিকত্বের দিকে এগিয়ে যায়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষকের উপস্থিতির গুরুত্ব আরও গভীর। বিদেশি একজন শিক্ষক বা গবেষক

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলে তিনি শুধু একটি শিক্ষক পদ পূরণ করেন না; তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেন নিজস্ব গবেষণা-সংযোগ, প্রকাশনার অভিজ্ঞতা, গবেষণাপদ্ধতিগত দক্ষতা, আন্তর্জাতিক অর্থায়নের যোগাযোগ এবং ভিন্ন একাডেমিক সংস্কৃতি। কিউএসও আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাতকে আন্তর্জাতিক গবেষণা-নেটওয়ার্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষক বৃদ্ধি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকীকরণের পাশাপাশি গবেষণার উৎপাদনশীলতা ও একাডেমিক খ্যাতি উন্নয়নেও সহায়ক হতে পারে। এই জায়গায় পূর্ববর্তী লেখাগুলোর সঙ্গে বর্তমান আলোচনার একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। একাডেমিক খ্যাতি উন্নত করতে হলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে আগে আন্তর্জাতিক একাডেমিক সমাজে দৃশ্যমান হতে হবে। কিন্তু দৃশ্যমানতা শুধু গবেষণা প্রকাশনার মাধ্যমে তৈরি হয় না; গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক চলাচল, সহযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগও গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিদেশি অধ্যাপক যদি কোনো বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন, তিনি তাঁর নিজস্ব দেশের সহকর্মীদের সঙ্গে যৌথ গবেষণা তৈরি করতে পারেন। একজন বিদেশি গবেষক-শিক্ষার্থী বাংলাদেশি তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে গবেষণা করলে একটি দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। একটি আন্তর্জাতিক শ্রেণিকক্ষ থেকে পরবর্তীতে যৌথ প্রকাশনা, সম্মেলন, শিক্ষার্থী বিনিময় এবং যৌথ গবেষণা অনুদানের জন্ম হতে পারে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত সরাসরি একাডেমিক খ্যাতির সূচক না হলেও এগুলো একাডেমিক খ্যাতি তৈরির পরিবেশকে শক্তিশালী করতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যাটি কেবল বিদেশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কম-এতটুকু বললে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকবে। মূল সমস্যা হলো বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী আন্তর্জাতিক আকর্ষণমূলক পরিচয় তৈরি করতে পারেনি। একজন বিদেশি শিক্ষার্থী কেন বাংলাদেশে পড়তে আসবেন? একজন বিদেশি অধ্যাপক কেন তাঁর নিজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা গবেষণায় যুক্ত হবেন? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান, গবেষণার অবকাঠামো, বৃত্তি, গবেষণার সুযোগ, নিরাপত্তা, আবাসন, ভিসা সুবিধা, ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষাক্রম, বৈশ্বিক স্বীকৃতি এবং শিক্ষা-পরবর্তী কর্মজীবনের সুযোগ-সবগুলো বিষয়কে একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশের রয়েছে কিছু অনন্য সুবিধা। বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী, দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, তৈরি পোশাকশিল্প, জলবায়ু ঝুঁকি, বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন অধ্যয়ন, অভিবাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি, ডিজিটাল রূপান্তর এবং সামাজিক উদ্ভাবনের মতো বহু বিষয় রয়েছে, যেগুলো আন্তর্জাতিক গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে যদি শুধু একটি স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাগন্তব্য হিসেবে নয়, বরং গবেষণাসমৃদ্ধ শিক্ষাগন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও গবেষক আকর্ষণের সুযোগ অনেক বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, নদী ও বন্যা ব্যবস্থাপনা, নগরায়ণ, জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র

হ্রাস, সামাজিক উন্নয়ন এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মতো বিষয়ে বাংলাদেশ নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র।

তবে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের গবেষণা সক্ষমতা আন্তর্জাতিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে শুধু ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, একাডেমিক বর্ষপঞ্জি এবং প্রশাসনিক তথ্য থাকলেই হবে না। সেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা তথ্যকেন্দ্র, শিক্ষাক্রমের বিস্তারিত বিবরণ, শিক্ষকদের পরিচিতি, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা, বৃত্তির তথ্য, আবাসন ব্যবস্থা, ভিসা সহায়তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দপ্তর এবং পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। আজকের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেওয়ার

আগে অনলাইনে গবেষণা করেন। তাই ডিজিটাল দৃশ্যমানতা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকর্ষণের একটি মৌলিক পূর্বশর্ত। এখানে আবার একাডেমিক খ্যাতির সঙ্গে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম আছে; আবার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা বাড়ায়। একইভাবে বিদেশি শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন কারণ সেখানে গবেষণার পরিবেশ ও সুনাম আছে; আবার বিদেশি শিক্ষক নতুন গবেষণা-নেটওয়ার্ক তৈরি করে সেই সুনাম আরও বাড়াতে পারেন। ফলে আন্তর্জাতিকীকরণ একদিকে সুনামের ফল, অন্যদিকে সুনাম তৈরির কারণও। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এই পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে হবে।

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত বৃদ্ধির সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ কিছুটা ভিন্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক একাডেমিক সুনাম, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং বিস্তৃত বিষয়ভিত্তিক পরিসর রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি উচ্চশিক্ষার একটি বৃহত্তর নীতিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য বিশেষায়িত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দপ্তর, অতিথি অধ্যাপক কর্মসূচি, প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বেতন কাঠামো, স্বল্পমেয়াদি গবেষণা বৃত্তি, আন্তর্জাতিক গবেষকোত্তর কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি চালু করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধা, ভিসা সহায়তা এবং শিক্ষার সনদ ও পাঠ্যক্রমের পারস্পরিক স্বীকৃতি ও স্থানান্তর ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। বিদেশি শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করতে চাইলে ভর্তি প্রক্রিয়াও আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আবার অন্য ধরনের সুযোগ রয়েছে। তাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ তুলনামূলকভাবে দ্রুত হতে পারে, ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে বিস্তৃত, এবং কিছু প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিও তৈরি হয়েছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কিউএস তথ্য অনুযায়ী ১৬,০২৭

শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং ৯০২ শিক্ষকের মধ্যে ৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক শিক্ষক। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী ৫২৯ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং ৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক শিক্ষক রয়েছে। এই উদাহরণগুলো দেখায় যে বেসরকারি খাতে আন্তর্জাতিকীকরণের কিছু সম্ভাবনা ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে, যদিও তা আরও ব্যাপক ও গভীর করা প্রয়োজন।

তবে আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করাও বিপজ্জনক হতে পারে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি কিউএস-এর স্কোর বাড়ানোর জন্য অল্প সময়ের চুক্তিতে কয়েকজন বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ করে, কিন্তু তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা-সম্পৃক্ততা না থাকে, তাহলে সেটি প্রকৃত আন্তর্জাতিকীকরণ হবে না। একইভাবে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়াতে গিয়ে শিক্ষার মান কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্য হওয়া উচিত মান, বৈচিত্র্য এবং একাডেমিক সমন্বয়-শুধু সংখ্যা নয়। এ কারণেই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে “কতজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী?” প্রশ্নের পাশাপাশি “আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশে কী অবদান রাখছে?”-এই প্রশ্নটিও করতে হবে। এখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও গুরুত্বপূর্ণ। কিউএস-এর বর্তমান পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে একটি পৃথক পরিমাপক হিসেবে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার আওতায় বিবেচনা করা হলেও বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে এর ওজন বর্তমানে শূন্য শতাংশ; আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতের ওজন ৫ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমান প্রধান র‍্যাংকিংয়ে শুধু আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর অনুপাত সরাসরি স্কোরে প্রভাব ফেলে, কিন্তু কিউএস-এর বিস্তৃত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু একটি বা দুটি প্রতিবেশী দেশের শিক্ষার্থী আকর্ষণ করা নয়; বরং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি অঞ্চলভিত্তিক বৃত্তি, ইংরেজিতে পরিচালিত স্নাতকোত্তর ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষাক্রম এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা বৃত্তি চালু করে, তাহলে বিদেশি শিক্ষার্থী আকর্ষণের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষার ব্যয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি মানসম্মত কিন্তু তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী শিক্ষা, গবেষণা ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সমন্বয় করতে পারে, তাহলে এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হতে পারে। তবে কম ব্যয় একাই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী শিক্ষার মান, গবেষণার সুযোগ, সনদের স্বীকৃতি এবং পড়াশোনা শেষে উচ্চশিক্ষা বা কর্মজীবনের সুযোগও বিবেচনা করেন। তাই “সস্তা শিক্ষা”

নয়, বরং প্রতিযোগিতামূলক ব্যয়ে উচ্চমানের শিক্ষা হওয়া উচিত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা কৌশলের মূল বক্তব্য।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাম্প্রতিক অবস্থানও আশাব্যঞ্জক। ২০২৬ সালের মে মাসে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেছেন যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করা হচ্ছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকর্ষণ এখন শুধু পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় নয়; এটি জাতীয় উচ্চশিক্ষা নীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে। (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে শুধু নীতিগত ঘোষণা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন একটি জাতীয় উচ্চশিক্ষা আন্তর্জাতিকীকরণ কৌশল। এই কৌশলের আওতায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আন্তর্জাতিকীকরণ পরিকল্পনা থাকা উচিত এবং সেটি পরিমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যেমন-আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত, কতটি দেশ থেকে শিক্ষার্থী এসেছে, শিক্ষার্থী বিনিময়, যৌথ প্রকাশনা, যৌথ তত্ত্বাবধান, আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুদান, অতিথি গবেষক, যৌথ শিক্ষাক্রম এবং আন্তর্জাতিক প্রাক্তন শিক্ষার্থী নেটওয়ার্ক। এর ফলে আন্তর্জাতিকীকরণ একটি শ্লোগান না হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতার অংশ হবে।

একই সঙ্গে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বৈষম্যও বিবেচনা করতে হবে। ১৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একই আন্তর্জাতিকীকরণ লক্ষ্য বাস্তবসম্মত নয়। গবেষণানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষক, গবেষক-শিক্ষার্থী এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতার লক্ষ্য বেশি হতে পারে। শিক্ষাদাননির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিনিময়, স্বল্পমেয়াদি শিক্ষাক্রম এবং যৌথ শিক্ষাদান বেশি গুরুত্ব পেতে পারে। আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থানীয় বাস্তবতা ও বিশেষায়িত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক পরিচিতি তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ সবার জন্য একই নীতি নয়, বরং নিজস্ব লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যভিত্তিক আন্তর্জাতিকীকরণ কৌশল প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি বাস্তবতা হলো মেধাপাচার। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষাবিদদের একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক একাডেমিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের সম্পূর্ণভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা সবসময় সম্ভব না হলেও অতিথি অধ্যাপক, খণ্ডকালীন শিক্ষক, যৌথ তত্ত্বাবধায়ক, গবেষণা পরামর্শক এবং স্বল্পমেয়াদি গবেষণা বৃত্তির মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব। এটি তুলনামূলক কম ব্যয়ে আন্তর্জাতিক একাডেমিক নেটওয়ার্ক তৈরির একটি কার্যকর পথ হতে পারে। একইভাবে প্রবাসী শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা সহযোগিতা তৈরি করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকর্ষণের ক্ষেত্রেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে

বসবাসরত বাংলাদেশি প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংগঠনগুলোকে শুধু পুনর্মিলনী বা সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকর্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি তৈরির অংশ করা যেতে পারে।

এখানে পূর্ববর্তী লেখায় আলোচিত গবেষণার মানের বিষয়টিও পুনরায় সামনে আসে। একজন বিদেশি অধ্যাপক কেন বাংলাদেশে আসবেন, যদি গবেষণা অর্থায়ন সীমিত হয়? একজন বিদেশি গবেষক-শিক্ষার্থী কেন আসবেন, যদি গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, তথ্যভান্ডার, তত্ত্বাবধান এবং প্রকাশনার পরিবেশ পর্যাপ্ত না হয়? ফলে আন্তর্জাতিকীকরণ আসলে গবেষণায় বিনিয়োগের বিকল্প নয়; বরং গবেষণায় বিনিয়োগের স্বাভাবিক ফল। একইভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত উন্নত না হলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বাড়ালেও শিক্ষার অভিজ্ঞতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই কিউএস-এর সূচকগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে একটি পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে দেখা প্রয়োজন। একাডেমিক খ্যাতি, শিক্ষকপ্রতি গবেষণার উদ্ধৃতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত-প্রতিটি একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। কিউএস-এর বর্তমান পদ্ধতিতে গবেষণা ও জ্ঞান আবিষ্কার ৫০ শতাংশ, শিক্ষার অভিজ্ঞতা ১০ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা ১৫ শতাংশ গুরুত্ব বহন করে; ফলে আন্তর্জাতিকীকরণ একটি বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক মান কাঠামোর অংশ। বাংলাদেশের জন্য তাই সবচেয়ে প্রয়োজন র‍্যাংকিংকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিকীকরণ নয়, বরং মানকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিকীকরণ। কিউএস র‍্যাংকিংয়ে স্কোর বাড়ানো একটি ফলাফল হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যেখানে বিদেশি শিক্ষক কাজ করতে চান, বিদেশি শিক্ষার্থী পড়তে চান, আন্তর্জাতিক গবেষক সহযোগিতা করতে চান এবং বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা নিজের দেশেই বৈশ্বিক একাডেমিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। এই পরিবর্তন ঘটলে কিউএস-এর স্কোর স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

সবশেষে, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণকে একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে দেখতে হবে। আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত বৃদ্ধি কেবল কিউএস র‍্যাংকিংয়ের জন্য নয়; এটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বজ্ঞান ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করার একটি কৌশল। বিদেশি শিক্ষক মানে নতুন জ্ঞান ও গবেষণা-নেটওয়ার্ক; বিদেশি শিক্ষার্থী মানে নতুন সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি; আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মানে নতুন গবেষণার সুযোগ; আর এই সবকিছুর সমন্বিত ফল হলো একটি প্রাণবন্ত বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি এই পরিবেশ তৈরি করতে পারে, তাহলে দেশের উচ্চশিক্ষা শুধু শিক্ষার্থী তৈরির ব্যবস্থা হিসেবে নয়, বরং আন্তর্জাতিক জ্ঞান উৎপাদন ও বিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। আগের ধারাবাহিক লেখাগুলোর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, অবকাঠামো সম্প্রসারণ বা শিক্ষার্থী ভর্তি বাড়ানোর মাধ্যমে সম্ভব

নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের শিখিয়েছে যে শিক্ষার মানের জন্য পর্যাপ্ত একাডেমিক মানবসম্পদ দরকার; একাডেমিক খ্যাতি আমাদের দেখিয়েছে যে বিশ্ব একাডেমিক সমাজে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য গবেষণা ও দৃশ্যমানতা অপরিহার্য। এখন আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের সামনে আরও বিস্তৃত সত্যটি তুলে ধরছে-একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একই সঙ্গে স্থানীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত হতে হয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা তাই শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম বা রাজশাহীর মধ্যে নয়; বরং সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে।

সুতরাং বাংলাদেশের প্রায় ১৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আগামী দিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংখ্যাগত সম্প্রসারণ থেকে গুণগত আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে যাত্রা। এই যাত্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে তার নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিশেষত্ব তৈরি করতে হবে। কোথাও জলবায়ু গবেষণা, কোথাও জনস্বাস্থ্য, কোথাও প্রকৌশল, কোথাও ব্যবসা, কোথাও উন্নয়ন অধ্যয়ন, কোথাও সমাজবিজ্ঞান, কোথাও কৃষি বা ডিজিটাল উদ্ভাবন-যে ক্ষেত্রেই শক্তি রয়েছে, সেটিকে আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান করতে হবে। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আন্তর্জাতিক শিক্ষক, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, যৌথ গবেষণা, শিক্ষার্থী বিনিময় এবং বৈশ্বিক একাডেমিক অংশীদারত্ব। যদি বাংলাদেশ এই পথ অনুসরণ করতে পারে, তবে আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত শুধু কিউএস-এর দুটি সূচক হিসেবে থাকবে না; এগুলো বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার রূপান্তরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হয়ে উঠবে। তখন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে আমরা আর কেবল “বিদেশি শিক্ষার্থী” হিসেবে দেখব না; বরং তাঁকে দেখব জ্ঞান ও সংস্কৃতির দূত হিসেবে। বিদেশি শিক্ষককে দেখব শুধু শিক্ষক হিসেবে নয়; বরং আন্তর্জাতিক গবেষণা-নেটওয়ার্কের একটি সেতু হিসেবে। আর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতাকে দেখব আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা হিসেবে নয়; বরং যৌথ জ্ঞান উৎপাদনের বাস্তব অবকাঠামো হিসেবে।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের প্রশ্নটি কিউএস র‍্যাংকিংয়ের একটি স্কোরের চেয়ে অনেক বড়। এটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বকে কী দিতে পারে এবং বিশ্ব থেকে কী শিখতে পারে-তার প্রশ্ন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় তখনই প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে, যখন তার ক্যাম্পাসে ভিন্ন দেশের মানুষ জ্ঞান বিনিময় করে, তার গবেষণা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আলোচিত হয়, তার শিক্ষকরা আন্তর্জাতিক একাডেমিক নেটওয়ার্কের অংশ হন এবং তার শিক্ষার্থীরা দেশীয় শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার পরবর্তী অগ্রযাত্রা তাই শুধু আরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং আরও বেশি বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার দিকে হওয়া উচিত। আর এই রূপান্তরই একদিন একাডেমিক খ্যাতি, গবেষণার প্রভাব, আন্তর্জাতিকীকরণ এবং সামগ্রিক কিউএস ফলাফল-সবকিছুকে একই সঙ্গে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে

পারে।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।